BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 75-82

পূর্ণেন্দুর মাধবী : প্রসঙ্গ কবিতা

অমিত মণ্ডল

সারসংক্ষেপ

সাহিত্য ও শিল্পের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী পূর্ণেন্দু পত্রী। শিল্পের বিচিত্র ধারায় অবাধ চর্চার ফলে তাঁর এক শিল্পের ছায়া আরেক শিল্পে এসে পড়ে। পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতায় যে সংলাপধর্মিতার মৌলিক গুণ পরিলক্ষিত হয় তার অন্যতম উৎস হলো তাঁর চলচ্চিত্র চর্চা। ১৯৬৫ সালে তৈরি তাঁর প্রথম সিনেমা 'স্বপ্ন নিয়ে'-র অন্যতম কেন্দ্রীয় অভিনেত্রী ছিলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী সিনেমা 'স্ত্রীর পত্র'-তেও তিনি মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি শিল্পীর মন। এই 'স্বপ্ন নিয়ে'-র নির্মাণকালেই পূর্ণেন্দুর কবিতায় উঠে আসেন মাধবী। শুধু কবিতায় নয়, কাব্যনাট্যেও। কবিতাটি হল 'মাধবীর জন্যে' এবং কাব্যনাট্যটি হল 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'। একসময় কানাঘুষো শোনা যেত, মাধবী এবং পূর্ণেন্দুর মধ্যে রয়েছে রোম্যান্টিক কোনো সম্পর্ক। পরে সে নিয়ে মাধবী লিখেওছেন কিছু কথা, যা মূল প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য মাধবীকে পূর্ণেন্দু কবিতায় কীভাবে পেলেন।

অমিত মণ্ডল
পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
e-mail: amitochitro@gmail.com

মূলশব্দ

পূর্ণেন্দু পত্রী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সিনেমা, কবিতা, সংলাপ

গবেষণার উদ্দেশ্য

সিনেমার চরিত্রাভিনেত্রী মাধবী কীভাবে হয়ে উঠলেন পূর্ণেন্দুর কবিতার নারী, আর কেন-ই বা কবিতায় মাধবীর বিপরীতে পরিচালক সবসময় নিজেকে স্থান দিলেন; সিনেমা, ব্যক্তিজীবন এবং কবিতার আলোচনার মাধ্যমে সেই উত্তর খোঁজা এবং আরো কিছু গবেষণামুখী প্রশ্ন তৈরি করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন আকরগ্রন্থ, সহায়কগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

'তোর কি যে কসম খাই, চোখের কোণে পানি আসছে ভাই'। পূর্ণেন্দু পত্রীর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দীর্ঘ লেখার এই ছিল শিরোনাম। এই লেখাটি আরো অনেকের লেখার সঙ্গে সংকলিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই প্রকাশিত 'পূর্ণেন্দু পত্রী এক বহুমুখী প্রতিভা' বইটিতে। এই নামকরণ কেবল অভিনব তাই নয় বরং এই সংকলনে প্রকাশিত অন্য সমস্ত লেখাগুলির শিরোনামের তুলনায় সবচেয়ে বেশি আন্তরিক। কিন্তু শিরোনাম পার করে যখন মূল লেখায় প্রবেশ করি তখন দেখি, লেখা ততটা আন্তরিক নয়। কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতি এবং কিছু জবাবদিহির কোলাজ। শিরোনাম যে আন্তরিক একটি লেখা পড়বার আশা মনে জাগায় তা থেকে সরে এসে এই লেখা হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সৌজন্যমূলক এক স্মৃতিচারণ।

আরও পরে ২০১২ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'মাধবীকানন' বইটিতে আমরা দেখি মাধবী নিজের আত্মজীবনীর একটি অধ্যায় রেখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রীর জন্য। অধ্যায়ের নাম 'স্বপ্ন নিয়ে : যে টেলিফোন আসার কথা...'। একে ঠিক নতুন লেখা বলা চলে না; আবার এও বলা চলে না এই লেখাটি সেই আগের লেখার পরিমার্জিত কিংবা পরিবর্ধিত রূপ। দুটি লেখাতেই কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি আছে (যদিও তথ্যের হেরফের ঘটে গেছে বহু) এবং কিছু প্রসঙ্গ সংযোজিত ও বিয়োজিত হয়েছে। দুটি লেখা পাশাপাশি পড়লেই পাঠক তা বুঝবেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে এই লেখাটিতে একটি নতুন প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়েছে, সেটি হল কবিতা। অবিশ্যি সেকথা শিরোনামেই স্পষ্ট, 'যে টেলিফোন আসার কথা...'।

মাধবীর লেখা অনুযায়ী 'যে টেলিফোন আসার কথা' কবিতাটি নাকি তাঁকে ঘিরেই লেখা। মাধবী বলেছেন, 'দীর্ঘদিনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার পরে কে প্রথম ফোন করেছি, উনি না আমি, আজ আর তা মনে নেই। আমি বলেছিলাম, 'আপনি আর ছবি করবেন না?'

'ইচ্ছে করে', পূর্ণেন্দুবাবু বলেছিলেন– 'কিন্তু যখনই ভাবি প্রোডাকশন ম্যানেজার কে হবেন, আঁতকে উঠি।'

'ঠিক আছে। আমি আপনার প্রোডাকশন দেখব।'

পূর্ণেন্দুবাবু আশ্বস্ত হলেন-'ঠিক আছে। তা হলে ছবি বানাব। আপনি আমাকে ফোন করবেন।'

সে সময় ব্যক্তিগত অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম। ভুলে গেলাম ফোন করতে। আর তাঁর পরেই পূর্ণেন্দু পত্রী লিখলেন-'যে টেলিফোন আসার কথা, আসেনি'।"[১]

মাধবীর এই ব্যক্তিগত অস্থিরতা কী? সেই সময় নির্মলকুমারের সঙ্গে তাঁর 'সম্পর্ক একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল।' বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি ঠিকই কিন্তু মাধবী 'একবস্ত্রে' সংসার থেকে বেরিয়ে যান সেসময়। সঠিক সাল তারিখ পাওয়া না গেলেও একটা ন্যায়সঙ্গত হিসেব কষাই যায়। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'কাপুরুষ' সত্যজিতের সঙ্গে মাধবীর শেষ ছবি, যার পর মাধবী ঘোষণা করেন তিনি আর সত্যজিতের সঙ্গে কাজ করবেন না। এসময় তিনি বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত নিলেও এর কয়েকবছরের মধ্যে তিনি নির্মলকুমারকে বিয়ে করেন। এখন ২০২০ সালে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আলাদা থাকলেও মাধবী ও নির্মলকুমার সেই বছর তাঁদের দাম্পত্যের ৫২ বছর পূর্ণ করেছেন।[২] সে অনুযায়ী ওঁদের বিয়ের সম্ভাব্য সাল ১৯৬৮। তাঁরা একত্রে সংসার

করেছেন ২৫ বছর। অতএব তাঁদের সেপারেশনের সম্ভাব্য সাল ১৯৯৩। এদিকে 'যে টেলিফোন আসার কথা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে 'তুমি এলে সূর্যোদয় হয়' কাব্যগ্রন্থে। ১৯৯৩-ই যদি মাধবী আর নির্মলকুমারের 'সন্ধিক্ষণ' হয় তবে কী করে পূর্ণেন্দুর এই কবিতা মাধবীকে ঘিরে হবে? আর মাধবী ও পূর্ণেন্দুর পূর্বোক্ত কথোপকথনের মর্মোদ্ধার করলে একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এ সেই সময় যখন পূর্ণেন্দু সিনেমা করা ছেড়ে দিয়েছেন। আর আমরা জানি 'তুমি এলে সূর্যোদয় হয়' যে সালে প্রকাশিত হয় সেই ১৯৭৬ সালে পূর্ণেন্দু মোটেই সিনেমা করা ছাড়েননি বরং সেই বছরই তিনি তৈরি করেন তাঁর 'অবনীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রটি। এবং ১৯৮২ সালের পর পর্যন্তও তিনি প্রত্যক্ষভাবে সিনেমা তৈরির কাজে যুক্ত থাকবেন। যদি এই কবিতা অন্য কোনোভাবে মাধবীকে ঘিরে হয়েও থাকে সে পার্থিব ঘটনা আমাদের অজানা। কিন্তু সাল তারিখের হিসেব আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দেয় মাধবীর দাবিতে একটা বড়ো রকমের গোলমাল রয়ে গেছে।

সরাসরি মাধবীর নামোল্লেখ করে পূর্ণেন্দু পত্রী একটি কবিতা এবং একটি কাব্যনাট্য লিখেছেন। কবিতাটি হল 'মাধবীর জন্যে' আর কাব্যনাট্যটি হল 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'। দুটিরই রচনাকাল সম্বন্ধে সাল-তারিখের অনুপুঙ্খ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে পূর্ণেন্দুর বয়ান থেকে জানা যায়, ১৯৬৫ সালের 'স্বপ্ন নিয়ে' সিনেমাটি না চললেও 'দীর্ঘদিন তার রেশ বাজতে থাকে' পূর্ণেন্দুর 'ভাবনার ভিতরে'। সেইরকম একটা সময়েই তিনি এই কাব্যনাট্যটি লিখেছিলেন। তখন তার নাম ছিল 'সিঁড়িতে বিদায় দৃশ্য'। পরে সেটি 'আগাপাশতলা পরিমার্জনা' করে নাম দেন 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত' এবং প্রকাশ করেন 'একালের রক্তকরবী' পত্রিকায়। অন্যদিকে 'মাধবীর জন্যে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে, পূর্ণেন্দুর 'শব্দের বিছানা' কাব্যগ্রন্থে। আমরা জানি পূর্ণেন্দুর প্রথম এবং দ্বিতীয় কবিতার বই প্রকাশের ব্যবধান প্রায় একুশ-বাইশ বছর। এই বাইশ বছর তিনি গদ্য-গল্প-প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, প্রচ্ছদ করেছেন, সিনেমা নির্মাণ করেছেন। কবিতাও লিখেছেন কিন্তু প্রকাশ করেননি কোনো কবিতার বই। যখন আবার প্রকাশ পেল কবিতা তখন দেখা গেল এই বহুবিচিত্র শিল্প মাধ্যমে গভীর বিচরণ তাঁর কবিতায় নিবিড় ছাপ রেখে গেছে এবং সেটা হলো তাঁর কবিতার সংলাপধর্মিতা। দেবেশ রায় চমৎকারভাবে আমাদের সেই কথা জানিয়েছেন, "আমার ভাবতে ইচ্ছে করে, পূর্ণেন্দু যখন গল্প উপন্যাস রিপোর্তাজ লিখছিল, গল্পের ছবি আঁকছিল, বই সাজাচ্ছিল, বইয়ের মলাট করছিল, উনিশ শতকের কলকাতা নিয়ে লেখা বুনছিল, ফিল্মের স্ক্রিপ্ট ছকছিল ও ভাবছিল আরো বেশি-তখনই, এই পুরো সময় জুড়ে, তার সঙ্গে পরিবেশের সংলাপ চলেছে, অবিচ্ছিন্ন। তখনো যদি সে কবিতা লিখে যেত, তা হলে কী হত জানি না, কিন্তু অব্যবহিত-কবিতা হয়ে না ওঠায় সেই নিয়ত সংলাপের পুঁজি কোথাও জমা হয়ে যাচ্ছিল, নেপথ্যে। তাই, দু'দশক পরে সে যখন আবার কবিতা লিখতে শুরু করে তার ভিতর কোনো অপ্রস্তুতি বা জড়তা কাজ করে না। ভাষা যেন ভিতরে-ভিতরে তৈরি হয়েইছিল। এখন কাগজে কালি দিয়ে লেখা হল মাত্র।"[৩] চমৎকার বিশ্লেষণ। কিন্তু দ্বিমত পোষণ করতে হয় একটা জায়গায়, পূর্ণেন্দু পত্রী দু'দশক কবিতা লেখেননি-এটা কষ্টকল্পনা। ('ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'-এর রচনাকালেই সে কথা স্পষ্ট, কিছু পরে 'মাধবীর জন্যে' কবিতাটি নিয়ে কথা বললে সেকথা আরো স্পষ্ট হবে।) পূর্ণেন্দু নিশ্চিতভাবেই কবিতা লিখেছেন, প্রকাশও করেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, কেবল কবিতার বই করেননি। পূর্ণেন্দু নিজেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছেন, 'দ্বিতীয় কবিতার বই একুশ-বাইশ বছর পরে। তার মানে এই নয় যে, এই ক'বছর কবিতা লিখিনি!'[৪] এই সময়কালেই কবিতার

মধ্যে মিশেছে সেই মৌলিক সংলাপধর্মিতা এবং এটাই হয়ে উঠেছে পূর্ণেন্দুর স্বাভাবিক প্রবণতা, নিজস্ব ভঙ্গি। আর এই দু'দশকের সময়কালেই লেখা হয়েছে 'মাধবীর জন্যে'।

'মাধবীকানন'-এ মাধবীর বয়ান অনুযায়ী এই কবিতা লেখা হয়েছে ১৯৬৫ সাল নাগাদ 'স্বপ্ন নিয়ে'র শুটিং চলাকালীন। সেই সময় 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র কাজ চলায় 'স্বপ্ন নিয়ে'র শুটিং পড়েছিল সন্ধে ছ'টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। কিন্তু শুটিং রাত বারোটা পার করে একটা, দুটো বা তিনটে পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। পরিচালকের হুঁশ থাকত না। বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন রাত বারোটায় মাধবী মুখের মেকাপ তুলে ফেলেছিলেন (যদিও এ নিয়ে মাধবীর পূর্বোক্ত দুটি লেখায় দুরকম বয়ান দেখা যায়) এবং তা দেখে পূর্ণেন্দু রাগ না করে সেদিনের মতো প্যাকাপ করেছিলেন। মাধবী বলছেন, "তারপর একদিন 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র কাজ শেষ হল। এবার আমি সকাল থেকেই সময় দিতে পারব। পরিচালক মশাইকে সেকথা জানালাম। পূর্ণেন্দুবাবু কোনো কথা না বলে একটা কাগজ নিয়ে কী লিখতে আরম্ভ করলেন। তখন দেখাননি। পরবর্তী কালে প্রকাশ পেল, সেটা ছিল একটা কবিতা।"[৫] মাধবীর মতে এই কবিতাই 'মাধবীর জন্যে'[৬]। পরে পূর্ণেন্দু নিজে মুখে মাধবীর কাছে সেকথার উল্লেখ করেছিলেন কি না বা মাধবী আর কীভাবে অতখানি নিশ্চিত হলেন সেকথার কোনও স্থূল প্রমাণ নেই। কবিতার দিকে চোখ রেখে বিচার করা যাক।

কবিতায় আমরা দেখতে পাই একটি গভীর অভিমান, এক স্বাভাবিক দূরত্ব এবং এক না হয়ে ওঠা গল্প। মাধবীকে পূর্ণেন্দু 'আপনি' সম্বোধন করতেন। কবিতাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কবিতাটি নিবিড়ভাবে পাঠ করলেই বোঝা যায় ওখানে কবি ও পরিচালক মাধবীকে সম্বোধন করে এই কবিতা লিখলেও মাঝে মাঝেই মাধবীকে সামনে রেখে আসলে নিজের সঙ্গেও কথা বলছেন। কবিতাটি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যেন একটি সিনেমার শুটিং চলছে। কিন্তু আসলে এ তো জীবনের চিত্রনাট্য। কবিতার প্রথমেই থাকছে একটি আয়না, যার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন মাধবী (আসলে পূর্ণেন্দু)। সেই আয়নার পাশে আঁকতে বলা হচ্ছে 'অন্ধকার ছায়া'। দৃশ্য ব্যথিত এবং তার পট জুড়ে থাকছে 'চিত্রিত আঁধার'। পরের লাইনেই কবি বলছেন, 'দেওয়ালের ছবিটাকে একটু সরাতে হবে ভাই।' কোন ছবি? যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, 'জুলিয়েট জ্যোৎস্নার ভিতরে/ রক্তে উচ্চকিত তৃষ্ণা রোমিওর উষ্ণ ওষ্ঠাধরে।' অর্থাৎ সংরক্ত প্রেম। এই প্রেম এবং তার উচ্চকিত ভঙ্গিকে সরিয়ে রাখতে হবে? কার প্রেমকে সরিয়ে রাখতে বলছেন পূর্ণেন্দু? আর কাকেই বা 'ভাই' সম্বোধন করছেন? 'ভাই' সম্বোধন করছেন নিজেকে। নিজের প্রতি নিজের সহমর্মিতা বোধ থেকে নিজেকে 'ভাই' বলে নিজের প্রেমকেই সরিয়ে রাখতে বলছেন তিনি।

এবার তিনি ডাকছেন মাধবীকে। সেই ব্যথিত দৃশ্যের মাঝে এসে মাধবীকে দাঁড়াতে বলছেন। 'লাইটস বার্ণিং'। আলো জ্বলছে। ব্যথিত দৃশ্যের মাঝে এই 'লাইটস বার্ণিং'কে কবির অন্তর্দাহ বলেই মনে হয়। এখন মাধবীর একটি ক্লোজআপ নেবেন কবি। কবি বলেন, 'এখানে দাঁড়ান, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে প্লিজ।' বাঁ দিক? মানে হৃদয়ের কাছাকাছি? এবার 'মনিটর...' বুকের পর্দায় মাধবীকে রেখে নিজের মুখের সংলাপ মাধবীকে বলতে বলেন, 'কিছু লাভ আছে মনে রেখে?' কী মনে রেখে লাভ নেই? ছোট ছোট অভিমান, যা মনে রাখলে দূরত্বের আড়ালে আসলে নৈকট্য বাড়ে?

কিন্তু বেশি স্পষ্ট না বরং নির্জন স্বরে এই কথা বলতে বলেন কবি। যেন স্বগতোক্তি, 'নিজের আত্মার সঙ্গে কথোপকথন।' 'যেন মনে হয়/ওষ্ঠ হতে উচ্চারিত কয়েকটি শীতল বাক্য নয়।' বরং এই সংলাপে থাকবে সন্ধ্যাপৃথিবীর বনবীথিতলে ঝরতে থাকা অবসন্ন কুসুমের নীরব রোদন। লক্ষ করার মতো বিষয়, কুসুম মানে কুঁড়ি, ফুল নয়। অর্থাৎ যার সম্ভাবনা ছিল অথচ ফুটতে পারল না। অবসন্ন মনে ঝরে যাওয়ার যে রোদন, সেই নীরবতায় পূর্বোক্ত সংলাপের আড়ালে আসলে যে কথা বলতে চাওয়া, তা হলো– 'মনে রেখো, মনে রেখো সখা,/ যেন কেহ কোনোদিন মনে রাখে নাই/ মনে আর রাখিবে না।' এখানে এসে কবিতায় আর কবির মনে যে বেদনাময় টানাপোড়েন জেগে ওঠে তা আর পাঠকের অগোচরে থাকে না। কবিই সে আড়াল রাখতে চান না। পাঠকের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেন বইয়ের পাতার মতো। কিন্তু কবি বুঝতে পারেন 'জ্যোৎস্নার ভিতরে কোথাও আহ্বান নেই আর'। আহ্বানহীন 'জ্যোৎস্নার ভিতরে' 'গোলাপের মহিমায় ফুটে' থাকা উষ্ণ ওষ্ঠাধরের এখন কেবল নিদারুণ অপেক্ষা, 'কবে পাখি বলে যাবে, রাত্রি হলো অবসান বনবীথিতলে।' কোন রাত্রি? নীরব রোদনের সন্ধ্যা পেরিয়ে যে রাতে প্রাণ আসল কথা বলতে চায়, 'মনে রেখো, মনে রেখো সখা'। আসলে মনে রাখতে নেই, এই কথাও কবি জানেন। তাই সেই না হয়ে ওঠা গল্পের নিদারুণ ভবিতব্যের জন্য এই নিদারুণ অপেক্ষা।

রাত্রির অবসান হয়েছে। প্রেম এখন অন্তঃসলীলা নদী। দৃষ্টিও নত। কারণ 'সম্মুখে কোথাও কোনো দেখিবার মত দৃশ্য নাই।' অপেক্ষা আর টানাপোড়েন থেকে বাস্তবের মাটিতে নামলে চোখের সামনে দেখবার মতো কোনো দৃশ্য থাকে না; সব দৃশ্য বন্ধক দিয়ে আসতে হয় স্বপ্নের কাছে। লক্ষণীয় কবিতায় দুবার সাধুভাষার প্রয়োগ হল। এবং এই দুটি কথাই অলঙ্ঘনীয় সত্য। এক, "মনে রেখো, মনে রেখো সখা,/ যেন কেহ কোনোদিন মনে রাখে নাই/ মনে আর রাখিবে না।" এবং দুই, 'সম্মুখে কোথাও কোনো দেখিবার মতো দৃশ্য নাই।'

এখন কেবল "নিবন্ত ধূপের সাদা ছাই/ রজনী-পোয়ানো কিছু মৃত গোলাপের দীর্ঘশ্বাস/ হাঁ-করা নেকড়ের মুখে দগ্ধ সিগারেট/ এইটুকু দৃশ্য শুধু পড়ে আছে কাঠের টেবিলে।" অর্থাৎ সমস্ত না হয়ে ওঠা গল্প আর ব্যর্থ মনোরথের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য। তারপর আবারও 'লাইটস্‌বার্ণিং', কিন্তু এবার সত্যি অভিনয়, যেমন আমরা আমাদের জীবনে করে থাকি। তাই এবার মাধবীরও মুখে 'মেক-আপ'। যে মেক-আপ নিয়ে একটা ছোট অভিমানের সূত্রপাত তা বাঁকবদল করে এসে দাঁড়ায় জীবনের রঙ্গমঞ্চে। 'এবার টেকিং।' কবি মনে করিয়ে দেন, "মাধবী, নিশ্চয়ই মনে আছে সংক্ষিপ্ত সংলাপটুকু/ 'কিছু লাভ আছে মনে রেখে?"

এভাবেই পরিচালক ও মাধবী নিজেদের পার্থিব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে হয়ে উঠছেন এমন দুই মানব মানবী যাদের মধ্যে এক গল্পের জন্ম হয় কিন্তু সেই চারাকে মেরে ফেলাও যায় না বাড়তে দেওয়াও যায় না। তাই মানব এসে আশ্রয় নেন কবিতার কাছে আর সেই না-পাওয়া কিংবা না-পেতে-চাওয়া মানবীকে সযত্নে এঁকে রাখেন সেই কবিতায়।

মাধবী বলেছিলেন, 'অনেকেরই ধারণা যে, পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে বোধহয় আমার একটা রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল। হ্যাঁ, রোমান্টিক সম্পর্ক একটা ছিল আমাদের মধ্যে।'[৭] কিন্তু এও জানিয়েছেন, 'মানব-মানবী হিসেবে' পূর্ণেন্দু এবং তাঁর মধ্যে 'কোন স্থূল ভালবাসা ছিল না।' ছিল 'শিল্পীর রোমান্টিকতা'। 'শিল্পীর রোমান্টিকতা হল, এক

শিল্পী আরেক শিল্পীকে ভালবাসে অর্থাৎ শিল্পীর শিল্পকে, শিল্প-কর্মকে ভালবাসা।'৮ 'স্থূল ভালবাসা'য় বৈধতা-অবৈধতার পাঠ আমাদের নিতেই হয় কিন্তু কবিতায় বা শিল্পে বৈধ বা অবৈধ বলে তো কিছু হয় না। তাই দৃশ্যপট থেকে রোমিও-জুলিয়েটের ছবি 'একটু সরাতে' হলেও ভালোবাসা আপন গভীর 'পুলকবেদনা' নিয়ে কবিতায়, ছবিতে থেকেই যায়।

মাধবী ছিলেন পূর্ণেন্দুর অনুপ্রেরণা। ১৯৯৮ সালে এই 'প্রেরণা'কে তিনি বলেছিলেন রটনা, পরে নিজের আত্মজীবনীতে নিজেই স্বীকার করলেন সেকথার সত্যতা। মাধবী বলেছেন, 'আমি চেষ্টা করেছি তাঁকে সাহস দিতে, অনুপ্রাণিত করতে, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও আমার সাধ্য কতটুকু?'[৯] পূর্ণেন্দুও বলেছেন মাধবীর কথা, 'মাধবী না থাকলে আমি ছবি করতে পারতাম না'। মাধবী প্রেরণাদাত্রী হিসেবে নিজের কথা বলতে গিয়ে এ-ও বলেছেন, 'দেশলাই কাঠির আগায় যেমন বারুদ থাকে, দেশলাই বাক্সের গায়েও তেমনই বারুদ লাগানো থাকে। দুইয়ের ঘর্ষণে আগুন জ্বলে ওঠে। আমি ওই বাক্সের গায়ে লাগানো বারুদের ভূমিকা পালন করে গিয়েছি।'[১০] হ্যাঁ, আগুন জ্বলেছে; আর আলোও। সেই আলো এসে পড়েছে কবির মনে। কবিতার জন্ম হয়েছে। 'মাধবীর জন্যে' সেই আলো এসে ছুঁয়েছে পাঠকের হৃদয়।

অতএব কোথা থেকে 'মাধবীর জন্যে' কবিতার জন্ম তা স্পষ্ট হলো। পাশাপাশি এও প্রমাণিত হলো যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে পূর্ণেন্দুর সুগভীর যোগ এই কবিতা রচনার অন্যতম ভিত্তিভূমি। আমরা আগেই জেনেছি, 'মাধবীর জন্যে' কবিতাটিতে প্রথম প্রত্যক্ষ সংলাপধর্মিতা উঠে এসেছে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে পূর্ণেন্দুর চলচ্চিত্র চর্চা এতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। পূর্ণেন্দুর সিনেমার চিত্রনাট্যে যেমন অখণ্ড কবিমনের প্রকাশ পায় তেমনই কবিতায় প্রভাব ফেলে সেই চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্য কাহিনি। আর এভাবেই চলচ্চিত্রের সংলাপধর্মিতার ছায়া অবলীলায় মিশে যায় কবিতার শরীরে।

আমরা এতক্ষণে জেনেছি এই 'স্বপ্ন নিয়ে' চলচ্চিত্রেই পরিপুষ্টি লাভ করে জন্ম নিয়ে 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত' কাব্যনাট্যটি। সিনেমার একটি দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল, বিজন জমিদার বাড়ির পুরাতন বাগান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে ভাস্কর্যের একটি ভাঙা হাত। সেই ভাঙা হাত-ই হয়ে উঠল এই কাব্যনাট্যের প্রাণবস্তু।

'সিঁড়িতে বিদায় দৃশ্য' মাধবী আর বিজনের সংলাপ-সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু পরিমার্জনার পর 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'[১১]-এ সেই সংলাপ তৈরি হল মাধবী ও পরিচালকের মধ্যে। বিজনের সঙ্গে মাধবীর কথোপকথন কোন খাতে বয়েছিল তা আমরা জানিনা। কিন্তু সিনেমার বিজন চরিত্রটিকে যিনি নির্মাণ করেছেন সেই পরিচালকের সঙ্গে মাধবীর যে কথোপকথন আমাদের সামনে আছে তা থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় এই বিজন, পরিচালকেরই একটি ছায়া। সিনেমার সবকটি চরিত্রেরই সুতো বাঁধা থাকে পরিচালকের হাতে। কিন্তু মাধবীকে এখানে আর কেবল সিনেমার চরিত্র করে রাখেন না পূর্ণেন্দু। তাই মাধবী সিনেমার চরিত্রের নামে এই কাব্যনাট্যে উপস্থিত থাকেন না, থাকেন নিজের নামে, স্বমহিমায়। এবং সারা কাব্যনাট্যে পূর্ণেন্দু পরিচালক হয়ে মাধবীকে এটাই বোঝাতে থাকেন, কেন সিঁড়িতে বিজনকে বিদায় দেওয়ার সময় মাধবীর চোখে জল এসেছিল, কেন তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বিসর্জনে ডুবতে থাকার বেদনায় ভারাক্রান্ত, নত।

বিজনের সঙ্গে মাধবীর 'চেনাজানা মাত্র দুদিনের'। মাধবী 'তার অস্তিত্বের অলিগলি রাজপথ' কিছুই জানেন না।

বিজনও মাধবীর 'জীবনের জাহাজডুবির/ নথিপত্র জেনে যাবে, চেনাজানা অত দীর্ঘ নয়।' প্রেম-ভালোবাসার অবকাশ ঘটনাচক্রের কোনোখানেই ছিল না। পরিচালক প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাও বিজনের চলে যাওয়ার সময়, সিঁড়িতে বিদায় দৃশ্যে কেন মাধবীর চোখে দেখা দিয়েছিল 'অশ্রুর চিকন রেখা'? মাধবী উত্তরে বলেন 'চিত্রনাট্যে ছিল।' পরিচালক প্রত্যুত্তরে বলেন, 'চিত্রনাট্যে অশ্রু লেখা থাকে।/ অশ্রু তো থাকে না।' তবে কীভাবে গ্লিসারিন ছাড়াই সেই অশ্রু দেখা দিল মাধবীর চোখে?

বিজনের প্রতি 'প্রেম', 'ভালোবাসা' কিংবা 'গভীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মাথা-উঁচু-করা সাধ' থেকে যখন এই অশ্রু আসেনি তখন নিশ্চয়ই 'আরো বড় কোনো ডানার ঝাপট' কিংবা 'আরো কোনো নিমগ্ন খনন' এখানে আছে। আছে চাওয়া-পাওয়ার বৈপরীত্যের গভীর বেদনা। আসলে বিজন, মাধবীর অন্তরকে চিনেছিল একথা প্রমাণ হবে একটু পরেই। এবং তার সূত্র ধরিয়ে দেন স্বয়ং মাধবী-ই। মাধবী বলেন, "যে-শিকড় উপড়োনো আদৌ সহজসাধ্য নয়/ একমাত্র কুড়োলে কেটে রক্তপাত ছাড়া,/ বিজনবাবু কি তাঁকে সত্যি সত্যি আরোগ্য চেনাবে?"

পূর্ণেন্দু বলেন, রক্তকরবীর রাজার মতো মাধবীকেও একটি ছিদ্রহীন জাল ঘিরে আছে। বিজনের সাধ্য নেই তা থেকে মাধবীকে মুক্ত করে। কিন্তু বিজনের "তো কৃতিত্ব একটাই/ সুখী গৃহিণীর তৃপ্ত ছদ্মবেশখানা ছিঁড়ে খুঁড়ে/ সে তো ঠিকই বুঝে গেছে" যে মাধবী ভালো নেই। যে সংসার সাজানো মনে হয় বাইরে থেকে তার ভেতরে কোনো প্রাণ নেই- নেই স্বামীর সঙ্গে সুসম্পর্কের কোনো সহাবস্থান। মাধবী ভুল ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া সেই খাম 'যার মধ্যে রয়ে গেছে ভাষা-স্তবকের ভিন্ন ঘ্রাণ।' এভাবেই বিজন মাধবীর অন্তরকে চিনে যায়। ভাস্কর্য সুন্দর কিন্তু অযাচিত সংসারের আগাছার ভারে পড়ে থাকা ভাস্কর্যের ভাঙা হাতটি নির্মম বেদনার। 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত'-এর মধ্যে যে বেদনার দ্যোতনা আছে, মাধবীর মধ্যেও আছে তেমনই সুপ্ত বেদনা। অচরিতার্থ জীবনের পরিচালক বিজন হয়ে যেমন ভাঙা হাত খুঁজে নিয়েছিল তেমনই অনুভব করতে পেরেছিল মাধবীর ভাঙা জীবনের বেদনার অন্তর্লীন গান। সেকারণেই মাধবীর চোখে জল। এখানে কি কোথাও বাস্তবের মাধবী আর সিনেমার চরিত্রাভিনেত্রী মাধবীকে এক করে দিলেন কবি? এবং সেই অভীপ্সাতেই কি 'সিঁড়িতে বিদায় দৃশ্য' বদলে হল 'ভাস্কর্যের ভাঙা হাত' এবং নিজের সৃষ্ট বিজন চরিত্রের জায়গায় আপাত নিরপেক্ষতা ও দূরত্ব নিয়ে পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং পরিচালক? বাস্তবের সত্য কী বলে জানা নেই, কাব্যের সত্য এই প্রশ্নের দিকেই আমাদের ধাবিত করে।

তথ্যসূত্র :

১. মাধবী মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০১২, মাধবীকানন, প্রথম প্রকাশ, চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রা: লি:, ১৩ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২, পৃ. ১৫৪-১৫৫

২. https://www.uttarbangasambad.com/madhabi-mukherjee-nirmalkumar-chemistry-remains-same-after-separation/

৩. সম্পা. মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, পূর্ণেন্দু পত্রী : শিল্পী ও ব্যক্তি, প্রথম প্রকাশ, সমন্বয়, ৪৪৬ পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা ৭০০০৬০, পৃ. ৫০-৫১

৪. পূর্ণেন্দু পত্রী, নভেম্বর ২০১৭, পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,

কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৯

৫. মাধবী মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০১২, মাধবীকানন, প্রথম প্রকাশ, চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রা: লি:, ১৩ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২, পৃ. ১৫০

৬. পূর্ণেন্দু পত্রী, নভেম্বর ২০১৭, পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৯-৪০

৭. সম্পা. তপন কর, ১৭ জুলাই ১৯৯৮, পূর্ণেন্দু পত্রী : এক বহুমুখী প্রতিভা, প্রথম প্রকাশ, আলেয়া প্রকাশনী, কানাইপুর, বাঁটুল, হাওড়া ৭১১৩১২, পৃ. ১৭০

৮. ঐ, পৃ. ১৭০

৯. মাধবী মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০১২, মাধবীকানন, প্রথম প্রকাশ, চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রা: লি:, ১৩ বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২, পৃ. ১৫৪

১০. ঐ, পৃ. ১৫৪

১১. পূর্ণেন্দু পত্রী, জানুয়ারি ১৯৯৮, কাব্যনাট্য, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৬১-৬৯